# অভিশপ্ত

(গল্পগ্রন্থ – মেঘমল্লার)

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওধারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

ও অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগল।

সময়টা পুজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল । ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হ'ল।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে—মেঘে আধাঢাকা চতুর্দশীর জ্যোৎস্না চিক্‌মিক্ করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্ন গাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে।....বাইরে একটু ঠান্ডা থাকলেও আমি ছই-এর বাইরে বসে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম....বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ-পনেরো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। আর একটু রাত হল। খালের দু'পাড়ের নির্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই, শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন—এত রাত্রে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ছই-এর মধ্যে। এসব জঙ্গলে বুঝলেন না?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, তাঁরই লঞ্চে করে তিনি একবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন—সেই সব গল্প ।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হ'ল।

মাঝি আমাদের নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে বলে উঠল—বাবু, একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেখানেই বাঁধা হল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দুধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্যন্ত চুপ করেছে....সঙ্গীকে বললুম—মশায়, এই তো সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না তো নৌকোর ওপর ?

সঙ্গী বললেন—না পড়লেই আশ্চর্য হবে !

শুনে অত্যন্ত পুলকে ছই-এর মধ্যে ঘেঁষে বসলুম। খানিকটা বসে থাকবার পর সঙ্গী বললে—আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে না, আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ করে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে বলে মনে হ'ল না ; ভাবলুম, তবে আমিই বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি—মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপাশে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।....তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম—গ্রামোফোন ? এ বনে এত রাত্রে গ্রামোফোন বাজাবে কে ? কান পেতে শুনলুম—গ্রামোফোন না। অন্ধকার হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্তকরুণ সুরে কি বলছে।....খানিকটা শুনে মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতলার ছাদে গ্রামোফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট, অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছয়—এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল—কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হ'ল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল....তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকোর তলায় ভাটার জল কল্‌কল করে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়া-ঝোপে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলুম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে, ডেকে কি হবে, তার চেয়ে, বরং নিজে জেগে বসে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম ; তারপর আবার ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন অংশ থেকে সুস্পষ্ট উচ্চ আর্তকরুণ ঝিঁঝি পোকার রবের মত তীক্ষ্ণস্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল—ওগো নৌকাযাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ....আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে ম'লাম.....আমাদের ওঠাও ওঠাও.....আমাদের বাঁচাও।

নৌকোর মাঝিটা ধড়মড় করে জেগে উঠল। আমি সঙ্গীকে ডাকলুম—মশায়,ও মশায়, উঠুন উঠুন।

মাঝি আমার কাছে ঘেঁষে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছিল। বললে—আল্লা ! আল্লা! শুনতে পেয়েছেন বাবু ?

সঙ্গী উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি, কি মশায় ? ডাকলেন কেন ? কোন জানোয়ার-টানোয়ার নাকি ?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে কান খাড়া করে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ....ভাটার জল নৌকোর তলায় বেঁধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল....

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি তবে.... মাঝি বললে—হ্যাঁ বাবু, বাঁয়েই কীর্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন—তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো
রাখলি কেন? বেকুব কোথাকার !....

মাঝি বললে—তিন জন আছি বলেই রেখেছিলাম বাবু। ভাটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবার তো জো ছিল না।

কথাবার্তার ধরন শুনে সঙ্গীকে বললুম—কি মশায়, কি ব্যাপার ? আপনি কিছু জানেন নাকি ?
ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বললেন—ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল। আলো জ্বেলে বসে থাকা যাক—রাত এখনও ঢের।

মাঝিকে বললুম—তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি ?

সে বললে—হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই তো আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আরও দুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও ডাক শুনেছি।

সঙ্গী বললেন—এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় বলে আর এ অঞ্চলে কোনো লোকালয় নেই বলে, শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে বসে সঙ্গীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম।

তিন শ' বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এ অঞ্চলে তখন বারোভুঁইয়ার দুই প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মশনদ-ই আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহানার বাহির সমুদ্র, যাকে এখন সন্দ্বীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেতে বসে থাকত।

সে সময় এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা কীর্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেকবার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দ্বীপ তখন ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় করে গড়তে হত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর একটা খাল বড় নদীতে পড়ত, বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল, যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আশপাশের জমিদারী এমন কি নিজের জমিদারীর মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী-কন্যা লুঠপাট করা— রূপ মহৎ কার্যে সেগুলি ব্যবহৃত হত।

কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্তি রায়ের এক বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়দের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশী ছিল। কীর্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারায়ণ তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান। নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী ও বন্ধু ।

সেবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যে দিনকতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মীদেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মতন স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন।। দু'একদিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হয়ে উঠতে হ'ল। নরনারায়ণ রায় তরুণবয়স্ক হলেও একটু গম্ভীর-প্রকৃতি। বিদ্যুৎচঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ-পরিহাসে গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল। স্নান করে উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নানা জায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নীচেই তাজ চাপা আছে—যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে খুঁজেছেন।....তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল।

তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হতে লাগল, যা কোন কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়।...তরল-মস্তিষ্ক বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার-জর্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হলেও বাইরে স্ত্রীকে বললেন—দু'দিনের জন্য এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে রকম বিব্রত করে তুলেছ, ও আর কখনো এখানে আসবে না

দিন-কয়েক এ রকমে কাটবার পর কীর্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল। নরনারায়ণ রায়ও বন্ধুপত্নী কখন কি করে বসে, সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করবার পর নিজের বজরায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মীদেবী বলে দিলেন—এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত-দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে বসে চৌকি দেবে—বুঝলে তো ?

নরনারায়ণ রায়ের বজরা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল । তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজ্‌রার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক ঝক করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোনোা নৌকো ছিল না—যারা সাহায্য করতে আসতে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র—সন্দ্বীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। নরনারায়ণের বজ্‌রার রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নরনারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ঊরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হলে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে।....খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন, যাকে নক্ষত্র বলে মনে হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেঝের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে।

আরো ক'দিন আরো ক'রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আনলে না। তিনি বুঝলেন, যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্মম মৃত্যু!....'

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন-দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল।....তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধা-কাতর দেহ প্রসারিত করে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।...প্রকৃতির একটা ক্‌লোরোফর্‌ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃত্যু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝতে পারলেন না—হঠাৎ আলো চোখে লেগে তার তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তাঁর সামনে প্রদীপ-হস্তে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধুপত্নী লক্ষ্মীদেবী। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হ'ল—এসব স্বপ্ন নয় ত ? কিন্তু ঐ যে দীপশিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায় !.....

নরনারায়ণ শক্তিমান যুবক, ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচবার উৎসাহে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রবর্তিনী ক্ষিপ্রগামিনী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখলেন যে তাঁরা কীর্তি রায়ের প্রাসাদের সামনের খালধারে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্মীদেবী একটা ছোট বেতে-বোনা থলি বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এতে খাবার আছে, এখানে খেও না, তুমি সাঁতার জানো, খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর যত শীগ্‌গির পারো পালিয়ে যাও।

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝলেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারী কীর্তি রায়ের জমিদারীর পাশেই এবং তাঁর অবর্তমানে কীর্তি রায়ই দনুজমর্দনের বংশধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্যসামন্ত কীর্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন ? কীর্তি রায় যে মাথা নীচু করে আছেন, তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর একপাশে বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্যপাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য ?

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন, তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখে সে চটুল হাস্য-রেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে-ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহ-কোমল হয়ে এসেছে। তাদের চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপর আকাশের বুক চিরে দিগন্ত—বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাটার টানে তীরের হোগলা গাছ দুলিয়ে কল্‌কল্‌ শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটেছে।....নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌঠাক্‌রুণ, চঞ্চলও কি এর মধ্যে আছে ?

লক্ষ্মীদেবী বললেন—না ভাই, তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুরঠাকুরের কীর্তি। এই জন্যে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আমার মনে হচ্ছে। গৌড়-টোড় সব মিথ্যে।

নরনারায়ণ দেখলেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মীদেবী আবার বললেন—আমি আজ জানতে পারি। খিড়কি গড়ের পাইক সর্দার আমায় মা বলে, তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই.....

নরনারায়ণ বললেন—বৌঠাক্‌রুণ, আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল—তুমি আমার সেই বোন, আজ আবার ফিরে এলে।

লক্ষ্মীদেবীর পদ্মের মত মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—ভাই, বলতে সাহস পাইনে, তবুও একটা কথা বলছি—বোন বলে যদি রাখ....

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা বৌঠাক্‌রুণ ?

লক্ষ্মীদেবী বললেন—তুমি আমার কাছে বলে যাও ভাই যে শ্বশুরঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে না ?

নরনারায়ণ রায় একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌঠাক্‌রুণ, তোমার কাছে বলে যাচ্ছি—তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা করব না।

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা করলেন-বৌঠাকরুণ, তুমি ফিরে যেতে পারবে তো ?

লক্ষ্মীদেবী বললেন—আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্তু যত দূর পারো সাঁতরে গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে চলে যেও।

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে পড়ে মিলিয়ে গেলেন.....

লক্ষ্মীদেবীর প্রদীপটা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল—তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের ছোট খালটায় দুখানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জমে গেল—সর্বনাশ! এরা কি তবে জানতে পেরেছে ? দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখলেন সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কীর্তি রায় বুঝতেন নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হয়ে ওঠে তো তাকে কেটে ফেলাই সমস্ত শরীরের পক্ষে মঙ্গল ।...পরদিন আবার দিনের আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মীদেবীকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল।....

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে ব'সে সব শুনলেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দু'ধারের মুখ বন্ধ করে কীর্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বসরোধ করে তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে তিনি চুপ করে রইলেন।...এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল.....বাশুন্তার লক্ষ্মণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চঞ্চলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠল। তাঁর মনে হল তাঁর অভাগিনী বৌ-ঠাকুরাণীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে.....মনে হল, তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্নাধৌত বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল-সুন্দর শ্রী... নীরব আকাশের তলে তাঁরই চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নব-মল্লিকার মতন ফুটে উঠেছে।....নরনারায়ণ রায়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ভূম্যধিকারী দস্যু—হঠাৎ পূর্বপুরুষের সেই বর্বর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে উঠল, তিনি মনে মনে বললেন—আমার অপমান আমি একরকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাক্‌রুণ, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য করব না কখনও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন এক শীতের ভোর রাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, সুলুপে, জাহাজে ভরে গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্তি রায়ের প্রাসাদদুর্গের ভিত্তি ঘনঘন কেঁপে উঠতে লাগল। কীর্তি রায় শুনলেন, আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে দুরন্ত পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাস্টিও গঞ্জালেস্। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও হয়েছে । পুরা বহরের বাকি অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে।

এ আক্রমণের জন্য কীর্তি রায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেসের যোগদানের জন্য। রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধ'রে শত্রুতা চলে আসছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্ যে তাঁদের পত্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্তি রায়ের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হ'লেও কীর্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চলল।

গঞ্জালেস সুদক্ষ নৌ-বীর। তার পরিচালনে দশখানা সুলুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্তি রায়ের নওয়ারার এক অংশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের

মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস দুখানা কামান-বাহী সুলুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকিগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ করবার জন্যে আদিষ্ট হ'ল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্তি রায়ের নওয়ারা শত্রু-বহর কর্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আটকে গেল—বার নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারলেন না। কীর্তি রায়ের নৌ-বহর দুর্বল ছিল না, কীর্তি রায়ের গড় থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আড্ডা সন্দ্বীপ খুব দূরে নয়, কাজেই কীর্তি রায়ের নৌ-বহর সুদৃঢ় করে গড়তে হয়েছিল।

বৈকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।....নরনারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে পড়ে, কীর্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু'পাড় ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঊর্ধ্বে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাঁক শকুনি কীর্তি রায়ের গড়ের উপর চক্রাকারে ঘুরছে....হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধু-পত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদভরা ম্লান মুখখানি, কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়ল—তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন তখনি ভরে উঠল।.....তিনি করেছেন কি ! এই রকম করে কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখতে এসেছেন ?

নরনারায়ণ রায় হুকুম জারি করলেন—কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়।

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নেই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনি নিজে গড়ের মধ্যে ঢুকলেন। তিনি এবং গঞ্জালেস গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন—দেখলেন সত্যিই কেউ নেই। পর্তুগীজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুঠপাট করতে গিয়ে দেখলে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লুঠপাট চলল.....কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্ণ কেবলমাত্র দুখানা সুলুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে চলে গেলেন।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে, পর্তুগীজ জলদস্যুর দল লুঠপাট করে চলে গেলে, কীর্তি রায়ের এক কর্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলে একজন আহত মুমূর্ষ লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিনলে—লোকটি কীর্তি রায়ের পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী। তার মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝলে, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল। সে বুঝলে কীর্তি রায় তার পরিবারবর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচের এক গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটি একমাত্র তাঁর সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না....কোথায় সে মাটির নীচে ঘর, তা স্পষ্ট করে বলবার আগেই আহত লোকটিই মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে সে গুপ্ত-গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলে না।

. এই রকমে কীর্তি রায় ও তার পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হ'ল না....সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্বত-প্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো কোন বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূ-কক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্যন্ত জানে না

ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিতর কীর্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের সারের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শূলো-কাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙা থামের অংশ—বারভুঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে, বর্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে । দীঘির যে ইষ্টক সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বনভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে.....সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকে তখন খাল দিয়ে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ

থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে—ওগো পথযাত্রীরা, ওগো নৌকাযাত্রীরা, আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম...দয়া করে আমাদের তোল....ওগো আমাদের তোল....

ভয়ে বেশী রাত্রে এ-পথে কেউ নৌকা বাইতে চায় না।